সাম্য সৌম্যই শান্তির উৎস

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ'-এর
গ্রন্থাগারে সংগ্রহে রাখার জন্য —
শ্রী সুকুমার বড়ুয়া / ১৪.০২.২০০৩

সাম্য সৌম্যই শান্তির উৎস

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

প্রকাশক
শ্রীযুক্ত রতন কুমার সিংহ
ও
সহধর্মিনী মুকুল সিংহ
গ্রাম- দুপচর, লাকসাম, কুমিল্লা।

প্রকাশকাল
আষাঢ়ী পূর্ণিমা ২৫৪৩ বুদ্ধাব্দ
২৭শে জুলাই '৯৯ ইংরেজী

মুদ্রণে
ময়নামতি আর্ট প্রেস
৫১, ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬১৪৭৯৬
(আন্দরকিল্লা মেটারনিটি হাসপাতালের পূর্ব পার্শ্বে)

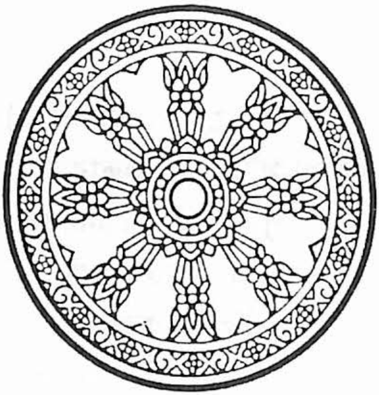
মূল্য ঃ বিশ (২০) টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান
বিশ্বশান্তি প্যাগোডা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেব নীলমণি সিংহ
স্বর্গীয়া মাতৃদেবী কলাবতী সিংহের
পুণ্য স্মৃতি বর্দ্ধনকল্পে
এই পুস্তিকাখানি
উৎসর্গ করলাম।

তোমাদের সন্তান
রতন কুমার সিংহ



সাম্য সৌম্যই শান্তির উৎস

তথাগত বুদ্ধের উক্তি–

"নামস্‌স এক ধম্মস্‌স সব্বেব বসমন্বগু।"

নাম এমন একটি ধর্ম- তাতে জগতের সকলেই আবদ্ধ। নামে জগৎ নিয়ন্ত্রিত। নামের বাহারে জগৎ মুগ্ধ। প্রত্যেক ব্যাপারে নামের জন্য মানুষ পাগল। আবার মহান জ্ঞানী পুরুষের নামের মাহাত্ম্যে মানুষ জীবন মুক্তির সরল সহজ পন্থার উপায়ও খুঁজে পায় বলে মানুষের ধারণা। বস্তুতঃ বিচার্য বিষয় হচ্ছে যে এই নামের সাথে গুণের কতটুকু সম্পর্ক থাকে। যদি নামের সাথে গুণের সম্পর্ক না থাকে, তবে সেই নাম অনর্থক নিরর্থক। অধিকন্তু এই নাম পদে পদে বিপদের কারণ। আলকাতরার টিনের দেহে ঘৃতের লেভেল লাগালে আলকাতরা আলকাতরাই থাকে, বিশুদ্ধ ঘৃত আর হয় না। সে কথা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সম্প্রদায় ও জাতির ক্ষেত্রেও তা-ই প্রযোজ্য। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সব লোক কি বোধিপরায়ণ? জৈন সম্প্রদায়ের সবই কি আত্মজিৎ! ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের সবই কি ব্রহ্ম-বিহারী? ইসলাম পন্থী মাত্রই কি আত্ম-সমর্পিত ও শান্ত প্রশান্ত? খৃষ্টান মাত্রই কি ক্ষমাশীল, ক্ষমা ধর্ম পরায়ণ? ব্যক্তির বিচারে যেমন ভালমন্দ থাকে, তেমনি সম্প্রদায়ের মধ্যেও উত্তম-অধম, সজ্জন-দুর্জন থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত নামের দম্ভ, সাম্প্রদায়িক আসক্তি বা জাতি-পাতির দুরন্ত প্রভাব যেদিন মানুষের মাথায় ভূতের মত চেপে বসে, সেদিন নিজকে নিজ সম্প্রদায় বা জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমার আপন জন অতীব সুজন, আর অপরকে পর, দুর্জন বলে মনে করেন। আপনার দলের লোক দুঃশীল দুরাচার, খুনী হলেও সে আমার আপন, সে সুশীল সদাচার, সৎ লোক আর মতের বহির্ভুত লোক মহৎ ও মহান হলেও সে আমার নয়। সে দুঃশীল, অসৎ। দীন দরিদ্র মুর্খ হয়েও অহং ভাবের দাপটে নিজকে প্রতাপশালী রাজা, অন্যকে হেয় হীনমন্য দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। আত্ম-শ্লাঘা পর-নিন্দার ঢোল বাজাতে থাকে। গুণের অধিকারী না হয়ে নামের আস্ফালনে মেতে উঠে। যেদিন সত্যের বাস্তব দৃষ্টি হারিয়ে নামের গোঁড়ামি আরম্ভ হয়, সে দিন শুধু হাস্যস্পদ পাগলামীই প্রকাশ পায় না, বরং গোটা সমাজের পক্ষেই বিপদের কারণ হয়। সেদিন জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, রাষ্ট্রীয়তা কিংবা আরো কত কত ক্ষুদ্র দল-উপদল, নিকায়গত বৈষম্য, কুলভিত্তিক ভেদ-দৃষ্টিতে প্রমত্ত হয়ে জ্বলন্ত অগ্নির ইন্ধন যোগাতে থাকে। ফলে এই অহমিকা, ভেদ বুদ্ধি বিষম দৃষ্টি, বিদ্বেষভাব সমাজের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপদ জনক হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদ, পার্থক্য-বোধের দুঃখ- অশান্তির কারণে সহস্র দিকে আগুন জ্বলতে থাকে।

আমিত্ব-বোধ, অভিমান, অহংকার, আস্ফালন, দম্ভ, গর্ব, গোড়ামি, আন্তম্ভরিতা ইত্যাদি শব্দগুলো মূলতঃ মান মনোবৃত্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যের সাথে তুলনা করা মানের লক্ষণ। অন্যের সৌন্দর্য, কৌলীন্য, বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যাবত্তা, শাস্ত্রজ্ঞান, চরিত্র, ধন-দৌলত, জায়গা-জমিন ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিজকে তুলনা করে শ্রেষ্ঠত্ব, সমকক্ষ ও হীন মনে করে বলেই মান, অভিমান। শ্রেষ্ঠ মনে করার মধ্যেই যেমন অহং প্রতীতি থাকে, তেমনি থাকে অন্যকে আপনার সমকক্ষ ও হীন করার মধ্যে। তৃষ্ণা দৃষ্টি মান এই ত্রিবিধাকারেই মানুষের অহংকার প্রকাশিত হয়। তৃষ্ণা দৃষ্টি মান এই ত্রিবিধ মনো-বিকার, মনোবৃত্তি লোভমূলক চিত্তেই উৎপন্ন হয়। সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থে তথাগত বলেছেন–

"সমো বিসেসী উদ বা নিহীনো,
তীসু বিধাসু অবিকম্পমানো
সমো বিসেসীতি ন তস্‌স হোতি
যো মঞ্‌ঞতি সো বিবদেথ তেন।"

তুলনার পদ্ধতি হল এরূপ ঃ- একজন ব্যক্তি সে অন্যের থেকে সকল দিকে সমান। সে সমকক্ষ ব্যক্তিটি অহংকার প্রকাশ করে – "আমি তাদের থেকে কোন দিকে কম না কি? সকল দিকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অহংকার করে– আমি তাদের মত হীন লোক না কি?" নীচ হীন ব্যক্তি অপর উন্নত, উচ্চতর ব্যক্তির সাথে তুলনাপূর্বক অহংকার করে– আমি কি তাদের ন্যায় বড় লোক? আমি কি অত বড় পণ্ডিত? এরূপ মনোভাব সম্পন্ন লোকের অন্তরে বাহিরে বিরোধ বিসম্বাদের বিরাম হয় না। বিরোধ ভাব নিয়ে সে কাল কাটায়। নাম যশের প্রকৃতি, চরিত্র, স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি না থাকাতে সমাজে পারস্পরিক যত সব গোলযোগ। সবসময় অধঃপতন, অবক্ষয়, সর্বোন্নতির অন্তরায়, অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে মৃত্যু অভিমুখী, মৃত্যুতুল্য দুঃখ। সম বিশেষাকারে মনো বিকার ধ্বংস হলে সে সর্বক্ষণ অকম্পিত থাকে। বিচলিত হয় না। অহংকার মমকার সর্ব অনর্থের মূল। মান অভিমান মনোবৃত্তি চিত্ত-প্রবাহে প্রচ্ছন্ন শক্তিরূপে নিহিত থেকেই জগতে যত বিবাদ বিসম্বাদ, কলহ বিগ্রহ বিরোধ সৃষ্টি করে। দাসানুদাস মুর্খ, পাগল সর্বত্র তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্র, ঘৃণিত, অবহেলিত হয়েও তাকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে দেখা যায়। এরূপ হতভাগ্যগণও যদি মানীর পর্যায়ে গণ্য হয়, তবে নগণ্য, জঘন্য আর কাকে বলব?

এ জগতে মানবতার পরিপন্থী যত প্রকার অশুভ শক্তি আছে মান ও ক্রোধ তাদের মধ্যে প্রধান। মান ও ক্রোধের আগুন আপন জীবনে, সমাজ জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যাতে দাবানলের সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য মানবতার সাধককে সর্ব প্রযত্নে মান ও ক্রোধকে সংযমিত করতে হয়। এখন একটু শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রোধের বর্ণনার প্রয়োজন। তথাগত বুদ্ধ বলেছেন–

"কোধং জহে বিপ্পজহেয্য মানং।"

ক্রোধ ত্যাগ কর। বিশেষ করে মান পরিত্যাগ কর। শাস্ত্রে ত্রিবিধ ক্রোধের কথা উল্লেখ আছে। ক্রোধ, প্রতিঘ ও উপনাহ। ক্রোধ বলতে সাধারণতঃ সকলের বোধগম্যে আসে। এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন নেই। প্রতিঘ ও উপনাহ ক্রোধের ভীষণতর ভীষণতম রূপান্তর। যা প্রচন্ড ক্রোধ, বধ চেতনা, হত্যার উপক্রমে ভীষণতর তা-ই- প্রতিঘ। বিশ্বে যত হত্যাকাণ্ড সবই প্রতিঘ কর্মের প্রকাশ্য রূপ। ইহা মারাত্মক। আর উপনাহ হচ্ছে কোন একটি ক্রোধমূলক তিক্ত ঘটনার প্রতিশোধ নিবার, শত্রুতা উদ্ধারের সুযোগ সন্ধানী প্রচ্ছন্ন ক্রোধই- উপনাহ। উপনাহের শক্তি অন্তর্নিহিত। ইহার বহির্বিকাশ নেই, অদৃশ্য, গুপ্ত। অন্তরে গেঁথে রাখে। প্রতিশোধের সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘকাল অন্তরে তুষের অগ্নিতুল্য ধিমি ধিমি জ্বলতে থাকে। এই জাতীয় ক্রোধকে বলে উপনাহ। ইহা সর্বাধিক ভীষণ। যার অন্তরে মান ও ক্রোধের প্রকোপ যখন জেগে বসে, তখন অতিশয় লাবণ্যময় অনিন্দ্যসুন্দর আকৃতি- বিশিষ্ট ব্যক্তিও বিশ্রী ভয়ঙ্কর কদাকার দৃশ্য ধারণ করে। তদ্দর্শনে মানুষের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। পদ্ম পত্রের অপর পৃষ্ঠার ন্যায় লালসে রংয়ের হৃদপিণ্ড কৃষ্ণবর্ণ আকার ধারণ করে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস অস্বাভাবিক বড় হয়ে যায়। ফলে আয়ুক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতি রাগে মানুষের রক্ত বমি হওয়ার কথা শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। আচার্য শান্তিদেব তাঁর বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–

"সর্বমেতত্ সুচরিতং দানং সুগত পূজনং
কৃতঃ কল্পং সহস্রৈর্যত্ প্রতিঘঃ প্রতিহন্তি তত্।"

সহস্র কল্প ব্যাপী চরিত্রের শুভ সাধনাকে, দানাদি কর্ম সম্পাদনকে এবং বুদ্ধ পূজাদি সমস্ত কুশল কর্মকে একমাত্র প্রতিঘ বা প্রচন্ড ক্রোধ এক মুহূর্তে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। যেহেতু দ্বেষের সমান পাপ নেই। ধৈর্য্যের সমান তপস্যা বা ধর্ম নেই। অধৈর্য্য এবং দ্বেষ শল্য হৃদয়ে বিদ্ধ হলে মনে শান্তি থাকে না, প্রীতি সুখ অনুভব হয় না। নিদ্রা আসে না। অস্থির হয়ে যায়।

নির্মমো নিরহংকারো শমাদাত্মীয়ত্বযো ঃ

তৃষ্ণা দৃষ্টি মানের চরিত্রার্থতার প্রভাবে কিংবা সত্যের অনুপলব্ধিতেই ক্রোধের ও মানের উৎপত্তি ঘটে। ইচ্ছিত বস্তুর অলাভে কিংবা অনিচ্ছিত বিষয়ের প্রাপ্তিতে ক্রোধ ও মানের সঞ্চার হয়। ইহা সাধারণ ক্রোধ, আত্মাভিমান মানুষের জীবনে আপন মুণ্ডে কুঠারাঘাত বা আত্ম-হত্যা তুল্য। তদ্ধেতু বিনীত কণ্ঠে অন্তরের মাধুর্যে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ গানে বলেছেন–

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলির তলে
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলই করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরি মরি পলে পলে,

সকল অহংকার হে আমার, ডুবাও চোখের জলে।
আপনারে যেন না করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমার ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়ে দাঁড়াও হৃদয় পদ্ম দলে
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

সত্যকে কোন জাতি, বর্ণ, বর্গ, নিকায়, সম্প্রদায়, দেশ কিংবা রাষ্ট্রের সীমায় বাঁধা যায় না। সৎ দৃষ্টি মানুষকে ভাল হতে শিক্ষা দেয়। ভাল মানুষ হলেই তার ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সৎ, সম্প্রদায়ের জন্যও সে শুভ, সারা দুনিয়ার মানব সমাজের জন্যও সে কল্যাণ ও গৌরবের পাত্র। অন্যথায় সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার রূপ চাকচিক্যময় নাম-লেভেলটাই যখন প্রাধান্য লাভ করে, তখন সত্য নিঃসার গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সত্যপ্রিয়তার অভাবে উচু নীচু দেওয়াল বানিয়ে মানুষ মানুষের মধ্যে বিভেদ বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে সত্য ভেদ বুদ্ধির দেওয়ালকে ভেঙ্গে চুড়ে সকল প্রকার বিভেদ মিটিয়ে দেয়। সাম্য ঐক্যের প্রভাবে ধরাধামে এরূপ মানবীয় সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হয়, যেখানে জন্মগত উচু নীচুর হীনোত্তমের বালাই আর থাকে না। জাতি উপজাতি কিংবা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ভেদ দৃষ্টির বৈষম্য চিরতরে দূরীভূত হয়। থাকে শুধু সবাই মানুষ। যেহেতু জগতের প্রত্যেকটি মানুষ একই উপাদানে উৎপন্ন। একই জীব রাসায়নিক বস্তু ও প্রাকৃতিক বিধানে নিয়ন্ত্রিত। একই সুখ দুঃখানুভূতিসম্পন্ন। এক ও অভিন্ন সত্যে সংহত। সত্য সার্বজনীন, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক। তাই বাংলা ভাষার কবি বলেছেন–

"নানা রংয়ের গাভীরে ভাই, এক রংয়ের দুধ,
দুনিয়া ঘুরিয়া দেখলাম, এক মায়ের পুত।"

প্রাণী মাত্রই নর ও নারী ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। বর্ণাবরণে কেউ শ্বেতাঙ্গ, কেউ কৃষ্ণাঙ্গ, কেউ পীতবর্ণ। জাতি হিসাবে কেউ গৌরবর্ণ ককেশীয়, কেউ পীতবর্ণ মঙ্গোলীয়, কেউ নিগ্রো, কেউ সঙ্কর অর্থাৎ মিশ্র জাতি। দেহের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সংগঠন যত রকম হোক না কেন, বিশ্ব ব্যাপী মানব বা জীব জগতের ভিতরকার রস, রক্ত, অস্থি, মাংস, মজ্জায় সব এক ও অভিন্ন। জৈবিক উপাদানে কোনরূপ পার্থক্য নেই। তথাপি মানুষ পারস্পরিক পার্থক্য বোধে দ্বিধা-দ্বন্ধের সৃষ্টি করে। পরস্পর সংঘর্ষে দাবানলের উৎপত্তি ঘটায়। কখনো বা কামনা বাসনার তাড়নায় কিংবা হিংসা ক্রোধের উত্তেজনায় যোগে-বিয়োগে ভীষণ বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে।

বৌদ্ধ ধর্মের নীতি আদর্শ-ভিত্তিক একটা প্রশ্ন প্রায়শঃ শোনা যায় যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের

পরিধেয় বস্ত্র সবারই জন্য একমাত্র বর্ণ হলদে কেন? অন্য যে কোন বর্ণের বস্ত্র তো ভিক্ষুদের জন্য নির্ধারিত হতে পারত। ইহার জবাব সহজ, সরল, তরল, সাবলীল অথচ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইহা শুধু বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ ভিত্তিক নহে। ইহা সমগ্র বিশ্বের জড় জগৎ ও জীব জগৎ সম্পর্কিত প্রশ্ন। ইহা সার্বভৌমিক প্রতীক, প্রত্যক্ষ পরিচয়।

এ জগৎ অনিত্য দুঃখময় নিঃসার, পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার সর্বশেষ লক্ষনীয় চিহ্ন স্বাভাবিক সংবিধান মৃত্যু। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, অলঙ্ঘনীয়। জীবাদি অজড় এবং বৃক্ষ তরুলতাদি জড় পদার্থ নিচয় যেই বর্ণের হোক না কেন, মৃত্যু বা পরিবর্তনকালে সবারই রং ফুটে উঠে হলদে। সুতরাং ভিক্ষুদের অসাধারণ সাংঘিক জীবন গ্রহণকালে হলুদ বর্ণের বস্ত্রের ব্যবস্থা অর্থাৎ জীবনের সর্বশেষ অনিত্য দুঃখ অসারতার নিদর্শন হলুদ বর্ণের বস্ত্র কণ্ঠ-ধারণ পূর্বক উপলব্ধি কর যে, তোমার জীবনের অন্তিম পরিণতি হবে হলুদ।

সমাজের মানুষ গ্রহণ করে অসাধারণ সাংঘিক জীবন। অন্তরে থাকে বুদ্ধ জীবনের নীতি আদর্শ। কণ্ঠে ধারণ করে জগতের প্রকৃত স্বরূপ অনিত্য দুঃখ অসারতার পদ পরিচায়ক চিহ্ন- হলুদ বর্ণের চীবর। তথাপি লোভ-দ্বেষ-মোহের তাড়নায় মনো বিকারের শিকার হয়ে একে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করে একে অন্যের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ বিভেদ-দৃষ্টির তক্‌মার সাথে সত্যের কিংবা নীতি আদর্শের কোন সম্পর্ক নেই। মদ ভরা বোতলে দুধের লেভেল লাগানো থাকলেও তা পান করলে নেশাই হবে। ভেদ-দৃষ্টির ভূত মাথায় চেপে বসলে কেবল বোতল ও বোতলের নাম লেভেলটাই মুখ্য আকার ধারণ করে। সত্য, নীতি আদর্শ সেখানে মিথ্যায় নিরর্থে পর্যবসিত হয়।

সমতাই সত্য। বিষমতা অসত্য, অভিশাপ। সমতা আসলেই মানসিক, বাচনিক ও কায়িক কর্মে বিশুদ্ধি আসে। সুতরাং যেখানে সমতা, সেখানেই অনাসক্তি। যেখানে অনাসক্তি সেখানেই সুখ-শান্তি। সমতাই সকল সুস্থতার মূল নিদান। তার প্রভাবে মানুষের অন্তর থেকে বিষমতা ও ভেদ-বুদ্ধিমূলক এক পক্ষীয় দৃষ্টি দূরীভূত হয়। গন্ডী যতই সঙ্কুচিত হয়, বিষমতা ততই তীব্র আকার ধারণ করে। তখন অসত্যের অন্ধতায় উন্মত্ত হয়ে জঘন্যতম পাপকর্ম করাও মানুষের অনুচিত বলে বিবেচিত হয় না। মানুষ পাশবিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। যেখানে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেখানে আপন-পরের সীমা ছিন্ন হয়ে ক্রুরতা ও শোষণ বন্ধ হয়। মৃদুতা সহকারিতা আসে। অন্যায় অত্যাচার বন্ধ হয়। সম-প্রাণতা, সম-দর্শিতা, সম-মর্মিতা ও বিশাল প্রাণতার সৃষ্টি হয়। অহং ভাবের স্থলে মাতৃভাব আসে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের স্থানে সহানুভূতি জন্মে। মানুষের প্রকৃতি এরূপ উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছলে মানুষ নিজের মধ্যে জগতের সকলকে এবং জগতের সকলের মধ্যে নিজেকে দর্শন করার মহান শক্তি উপার্জন করে। ইহাই প্রকৃত সাম্য।

জাগতিক সম্পর্কে প্রাণীগণ চার শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা– প্রিয়, অপ্রিয়, মধ্যস্থ ও শত্রু। সাধারণতঃ মানুষ আত্ম-পরায়ণ আত্ম-সর্বস্ব। নিজের প্রতি যে প্রেম-প্রীতি অপরের প্রতি তা থাকা সম্ভবপর নহে। আজন্ম কাল পোষিত স্বার্থ পরতা পরার্থে বিসর্জন দেওয়া অতীব কষ্টসাধ্য। জগতের প্রতি শুভেচ্ছা প্রণোদিত চিত্তে সাম্য সৌম্য ভাবের অনুশীলন করতে গেলে দেখা যায়– প্রিয় জনের দর্শনে, প্রিয় জনের বাক্য শ্রবণে মানসপট- আনন্দে ভরে উঠে। আনন্দের আতিশয্যে আমোদ, আমোদে-প্রমোদ, প্রমোদে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। এদিকে প্রিয় মধ্যস্থ ভাবতে গেলেও মনে বড় কষ্ট বোধ হয়। প্রিয় ব্যক্তি অপ্রিয় বা শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে দাঁড়ালেও দুঃখের অন্ত থাকে না। অপ্রিয়ের প্রতি সাম্য সৌম্য প্রীতি জন্মানো আরেক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অপ্রিয়কে প্রিয় করতে সাতিশয় শ্রান্তি ক্লান্তি আসে। প্রাণে মোটেই মানতে চায় না। মধ্যস্থকে সহসা প্রিয় করতে গেলেও অসহ্য বোধ হয়।

আবার শত্রুর স্মৃতি অন্তরে জাগরিত হওয়া মাত্রই হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। প্রচন্ড ক্রোধের সঞ্চার হয়। মননশীলতার দিক দিয়ে বিচার করলে এ সব ব্যাপার অতিশয় জটিল সমস্যা।

মানুষ ভিতরে-বাহিরে পাপে-পুণ্যে, সুখে-দুঃখে, ন্যায়-অন্যায়ে নিজেকে যেরূপ প্রত্যক্ষ জানতে পারে, পরকে সেরূপ অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। আবার নিজকে স্পষ্ট ভাবে না জেনে অপরকে জানাও সম্ভবপর নহে। নিজকে জানাই যে তত্ত্বের মূল ভিত্তি। শাস্ত্রে নিজের প্রতি সম্যক দর্শনই আত্ম-দর্শন নামে কথিত। জাগতিক প্রত্যেকটি ঘটনায় আপন বিবেক বুদ্ধিই স্বীয় জীবনে প্রকৃত সাক্ষী, ছলনা বাহিরে সর্বত্র চলে, কিন্তু নিজ বিবেককে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তদ্ধেতু বিবেক বুদ্ধি শাসিত নিজ অন্তরকে সাক্ষী করে জগতের সর্বদিক অনুসন্ধান করলে উপলব্ধি হবে যে "আমি যা চাই জগতের প্রত্যেক প্রাণী তা-ই চায়, আমি যা চাই না, জগতের কেউ তা চায় না। আমি সুখ শান্তি চাই, দুঃখ অশান্তি চাই না। জগতের সকল প্রাণী সুখ শান্তি প্রয়াসী, দুঃখ অশান্তির কামনা কারো জীবনে নেই। অতএব অন্যের সাথে আমার পার্থক্য কোথায়?" সবাই এক উপাদানেও রাসায়নিক গুণে সমান।

"এক-ক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং"

জগতের সকল প্রাণী এক ও অভিন্ন। সকলেই আমার সৌম্য মিত্র। সকল প্রাণীর সাথে পারস্পরিক সাম্য সৌম্যভাব রক্ষা করবে। ভ্রাতৃভাবে, মৈত্রী করুণায় শান্তি পূর্ণ সহবস্থানে মর্ত্যভূমেই স্বর্গ ভূমে গমনের হেতু প্রত্যয় গড়ে তুলবে।

যে বিষয়ে জগতের কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের মতভেদ নেই, যা সমস্ত ধর্মের ভিত্তি ও প্রাণস্বরূপ, যারা ধর্ম মানে না, এমন কি যারা ধর্ম সম্প্রদায়ের উচ্ছেদকামী, এমন অনেক মানব সঙ্ঘেরও যা মূলমন্ত্র। সেই সাম্য সৌম্যই এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই সাম্য– উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভেদে নানা প্রকার। যেমন– সামাজিক সাম্য, বস্তু সাম্য, রাষ্ট্রীয় সাম্য, আধ্যাত্মিক সাম্য ইত্যাদি। পৃথিবীর সকল লোকই সমান এবং ধনী, নির্ধন, রাজা , প্রজা, গৌড়বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, পীতবর্ণ, মঙ্গোলিয় সমস্ত বিভেদ শূন্য হয়ে সবাই সুখে দুঃখে এক ও অভিন্ন – এরূপ মতবাদ সামাজিক সাম্য। যদি কোন দ্রব্য একাধিক শক্তি দ্বারা এক কালে বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হয়েও কোন দিকে কোন অবস্থায় রূপান্তরিত না হয়ে একইভাবে স্থিত, অবিচালিত থাকে– তা বস্তু সাম্যের অন্তর্গত। রাষ্ট্রীয় সাম্যের শ্লোগান হল–

"কেউ খাবে তো কেউ খাবে না
তা হবে না, তা হবে না।"

রাষ্ট্রের সমগ্র নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় অধিকারে সবাই সমান। জীবন জীবিকার পালন লালন, শাসন অনুশাসন ক্ষেত্রে কোনরূপ অসামঞ্জস্য বা তারতম্য ভেদ-বিভেদ বিহীন, গুণীর গৌরবে, দোষীর শাস্তিতে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব নেই– তা রাষ্ট্রীয় সাম্য। গুণীর গুণ ও দোষীর দোষ লক্ষ্য করা সাম্যের লক্ষণ। মানুষ কিংবা জীব মাত্রই দৈহিক সংগঠনে, মন-মানসিকতায় পার্থক্যহীন। সমগ্র জীব জগৎ একই উপাদান, রসায়ন ও ধাতুতে সমতুল্য- ইহা আধ্যাত্মিক সাম্য। সাম্যের সাথে সৌম্যের বা মৈত্রী-করুণার সমন্বয় থাকা অত্যাবশ্যক। একের অভাবে অন্যটি অনেক সময় অর্থহীন নিরর্থক হয়ে পড়ে। ইহাও আধ্যাত্মিক সাম্যের অন্তর্গত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা কাব্য গ্রন্থে "অপমানিত" নামে একটা কবিতা আছে। সেই কবিতায় কবিগুরু ভারতীয় জাতিভেদ, শ্রেণী বিভাগ, হীনোত্তম সমাজ ব্যবস্থা ও বর্ণ বৈষম্যের ভয়ানক তাৎপর্য এবং সাম্য সৌম্যের গুণ- মহত্ত্বের বর্ণনা করেছেন। তিনি কবিতার সর্ব প্রথম পঙক্তিতে আক্ষেপ করে বলেছেন–

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

কবিগুরু ভারতীয় গণ-গোষ্ঠীকে উপলক্ষ্য করে বলেছেন– তোমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিংসা ক্রোধের উত্তেজনায়, ঘৃণা অবমাননা অবহেলার বশীভূত হয়ে পারস্পরিক বিবিধ বিরোধ সৃষ্টি করেছ। তোমরা কেউ দুপাতা ইংরেজী পড়ে অপরকে অজ্ঞ মুর্খ বলে নিন্দা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছ। কেউ বা কার্পাস সুতলি কণ্ঠে ধারণ করে অপরকে অস্পৃর্শ, অশুচি অপবিত্র নীচজাত বলে হিংসার চক্ষে দেখেছ। সকল প্রকার মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছ। পদে পদে ঠেকাইয়েছ। উচ্চ বর্ণের গম্য রাস্তায় নীচ বর্ণকে সার্বজনীন রাস্তায় চলতে নীচ বর্ণতে ঘন্টাধ্বনি করে চলতে বাধ্য করেছ, পাছে যেন উচ্চকুলীন সম্মুখে না পড়ে। মুখামুখি হলে তো জাত কুল ডুববে। এক পথে হাটতে দাও না, এক দেবতালয়ে এক সাথে ঢুকতে দাও না। স্পর্শিত খাদ্য ভোজ্য গ্রহণ করলে প্রায়শ্চিত্ত করে বিশুদ্ধ হও। নীচ জাতের ছায়া স্পর্শ করলে গঙ্গা জলে স্নান করতে যাও।

উচ্চ জাতের ক্ষৌর কর্ম করা পরামানিকের নিষিদ্ধ। আজ যাদেরকে দূরে ঠেলে সরিয়ে রেখেছ, পদ দলিত করে ধূলির তলায় ঢুকিয়ে রেখেছ। এমন এক দিন আসবে সবাই তাদের সমান হয়ে যেতে বাধ্য হবে। কবিগুরু কবিতায় বলেছেন–

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥

এখনো সময় আছে। যদি দেশের দশের সমাজের কল্যাণ চাও, আপনত্ব বোধে সাম্য সৌম্য মৈত্রী করুণাভরে তাদেরকে একাত্ম করে নাও। যদি ইহ-কাল পরকালে পরিত্রাণ চাও, তবে তাদেরকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে শত শতাব্দীর কলঙ্কিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। নচেৎ তোমাদের মঙ্গল নেই। এখনো বুঝতে পারছ না যে, এমনি একদিন আসবে কুসংস্কাররূপ পাপভরে এই অপমানিত মানব গোষ্ঠীর সমকক্ষ হয়ে যেতে বাধ্য হবে। এখনো তোমাদের উপলব্ধিতে আসে না যে, তথাকথিত নীচ হীন জাত রূপে তোমাদের ধারে পাশে স্বয়ং ভগবান নেমে এসেছে। ভগবানের অপর নাম পতিতপাবন। জীব কল্যাণ, পতিত জীবের উদ্ধার কল্পে স্বয়ং নারায়ণ। তোমাদের এই জাত্যাহঙ্কার জাতির কপালে অভিশাপস্বরূপ। এখনো যদি প্রেম বশে তাদের বক্ষে তোমাদের বক্ষ মিলাইয়ে জড়িয়ে ধরতে না পার, মিত্ররূপে মিশতে না চাও, মনে প্রবোধ না মানে, তবে ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গমন কালে একই পথের সহযাত্রী হতে হবে। তাতেও যদি 'সুখের মরা, দুঃখের মরা বলে বৈসাদৃশ্য কর তবে, শ্মশানে মশানে মৃর্তিকা গর্ভে সমতুল্য সমকক্ষ অবশ্যই হতে হবে। সেখানে তার কোন রূপ বাধা বিপত্তি থাকবে না। তাই কবিগুরু শেষ বারের মত বলেছেন–

"সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান
মৃত্যু মাঝে হতে হবে চিতাভস্মে সবার সমান।"

ইহা অবশ্যম্ভাবী, জাগতিক স্বতঃসিদ্ধ সংবিধান। এজন্য কবিগুরু চণ্ডালিকা নামে একবার নাটক, আরেকবার নৃত্য-নাট্য লিখলেন। ইহার মূল আদর্শ উদ্দেশ্য হল– ভারতীয় সামাজিক ঘৃণ্য বর্ণ বৈষম্য, হিংসাত্মক, অস্পৃর্শতা, জাতিভেদ প্রথা, অসাম্য নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সামান্য একটি ঘটনা অবলম্বন করে যুগযুগান্তরের কলঙ্ক মোচন। প্রকৃত মানবতা বোধের প্রতিষ্ঠা করলেন। আমি যদি বলি– আমি বৌদ্ধ, তা হলে হয়ে যাই- একেবারে অবৌদ্ধ। কারণ, বৌদ্ধ দর্শনে বা বৌদ্ধ শাস্ত্রে এমন তক্মা নেই। পৃথক করে বলার কোন শব্দ নেই যাদ্বারা অন্য থেকে আমি ভিন্ন হতে পারি।

ধর্মের ভিত্তি তা-ই। জীবনকে সাম্যে সত্যে মূল্যায়িত করার নামই তো ধর্ম। ধর্ম নীতির সাধনা দ্বারা যদি জীবন মূল্য প্রবুদ্ধ না হয়, লোক ব্যবহারে যদি সুন্দর না হয়, নিজের ও পরের জন্য যদি নিজের জীবনকে মঙ্গলময় করে তুলতে পারা না যায়, ধর্ম যদি ব্যবহারিক জীবনে প্রাণবন্ত হয়ে না উঠে, তা হলে ধর্ম মানুষের কোন্ কাজে লাগবে?

ধর্ম মৃত্যুর পর অনন্ত আকাশের পরপারে কোন এক অজ্ঞাত স্বর্গ লাভের আকাঙ্খায় জীবন যাপন করার জন্য নহে কিংবা মৃত্যুর পরে ধরিত্রীর অগাধ অচলান্তিকে অজ্ঞাতনামা নরক থেকে বাঁচার জন্য নহে। ধর্ম হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরে, মাঝে মাঝে যে লোভ-দ্বেষ-মোহের নারকীয় অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। তাকে নিবৃত করার জন্য এবং তা থেকে চিরতরে উদ্ধার পাওয়ার জন্য। ধর্ম পারস্পরিক ব্যবহার কুশলতা এনে দিবে। পারস্পরিক জীবনে স্বর্গীয় সুষমা মাখিয়ে সকলকে এক ও অখণ্ড মৈত্রী করুণায়। সাম্যে সৌম্যে আবদ্ধ করবে- এটাইতো ধর্মের আসল তাৎপর্য।

ধর্ম হচ্ছে প্রত্যক্ষ। ইহ জীবন বা ইহ জগতের জন্য অর্থাৎ বর্তমানের জন্যই। যিনি বর্তমানকে শুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁকে আর ভবিষ্যৎ বা পরলোকের চিন্তা করতে হয় না। তাঁর পরলোক বা ভবিষ্যৎ আপনা আপনিই বিশুদ্ধ ও সুগম হয়ে যায়। যে নিজের বর্তমানকে শুদ্ধ করতে পারেনি, যার অন্তরে দুষ্কর্মের অহরহঃ আগুন জ্বলছে, সে কি করে পারলৌকিক শান্তি সুখের আশা করতে পারে? সে সর্বক্ষণ পরলোকের মিথ্যা প্ররোচনায় উন্মুখ হয়ে নিজেই নিজকে প্রবঞ্চিত করছে এবং নিজের চরিত্র কলুষে অপরকে বাস্তব মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করছে।

ধর্ম হচ্ছে এক আদর্শ জীবন শৈলী। নিজে সুখে সম্মানে বেঁচে থাকার এবং অপরকে সুখে সম্মানে বাঁচতে দেওয়ার কল্যাণকারিনী বিশুদ্ধ জীবন পদ্ধতি। আপন-পর শান্তি লাভের বিমল পন্থা। সর্বজন কল্যাণময়ী আচার সংহিতা। নতুবা যে ধর্ম-নীতি মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। সে ধর্ম নীতি নিষ্ফল নিরর্থক। আসল কথা– কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত ধর্ম নহে, কোন অদৃশ্য শক্তির প্রসন্নতা উৎপাদনের জন্য অন্ধ ভক্তির ব্যর্থ প্রয়াস ধর্ম নহে। কোন বিদ্যা, কোন শিক্ষা কিংবা শাস্ত্রীয় অভিজ্ঞতা ধর্ম নহে। বাক-বিলাস কিংবা বুদ্ধি বিলাস ধর্ম নহে। প্রজ্ঞা শাসিত ভক্তি ও বিক্রম সহকারে সাধনা দ্বারা দুর্নীতি পরিহার এবং সুনীতির ধারণই ধর্ম। স্বভাবতঃ ধর্ম অনুশীলন ও সাধনায় নিহিত। ধর্মকে মন্দির, মসজিদ ও ধর্মগ্রন্থের পাতায় পাতায় আবদ্ধ না রেখে দৈনন্দিন জীবনের আচার-ব্যবহারে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, খেত-খামারে, জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে প্রয়োগ করতে পারলেই ধর্ম জীবনে সম্যকরূপে সজীব হয়ে উঠে। প্রাচ্যের বিখ্যাত রাষ্ট্রনেতা বলেছেন– ধর্ম হচ্ছে আফিমের নেশা। সম্প্রদায়গত আনুষ্ঠানিক ধর্মের নামে আমাদের যে গভীর নেশা, প্রকৃত প্রস্তাবে তা'-তো বড় নেশা। যা প্রকৃত ধর্ম নয়, তাকে ধর্ম-জ্ঞানে জীবন যাপন করার প্রবৃত্তিটুকু শুধু আফিমের নেশা কেন, বরং তার চেয়েও মস্ত বড় নেশা। আফিমের নেশা তো কিছুক্ষণের মধ্যে কেটে যায়, কিন্তু ধর্মের নামের যে

নেশা, কুসংস্কারের নামে যে মত্ততা, তা'তো মানুষকে সারা জীবন বেহুঁস করে রাখে। এই নেশা কাটানো দূরের কথা, এই নেশা আমরণ বেড়েই চলতে থাকে।

নেশাগ্রস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে, প্রকৃত ধর্মের চরম পরিণতি। অন্তিম লক্ষ্য উপলব্ধি করতে হলে সাধনার মাধ্যমেই আয়ত্ত করতে হবে। সত্যের সাধনা ব্যতীত আনুষ্ঠানিক, সাম্প্রদায়িক ধর্মের নামে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বিভেদ সৃষ্টি, তা মানুষের জীবনে বড় বিপদ। কাঁচা মাটির কলসী ভরসা করে সমুদ্র পার হতে যাওয়া যেমন বাতুলতা, তেমনি সম্প্রদায়গত ধর্মভাব মানুষের জীবনে বিপজ্জনক।

এ জগতে সুখ-শান্তি সকলেরই কাম্য। দুঃখ-অশান্তি জগতের কেউ চায় না। কি করে সুখ-শান্তি লাভ হয় তার যথার্থ পদ্ধতি জানা না থাকলে দুঃখ অশান্তি থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় মূঢ়তা বশতঃ নিজের সুখ-শান্তিকে শত্রুর ন্যায় ধ্বংস করে। জগতের সর্ববিধ দুঃখ-অশান্তি দূর করে জগতকে সকল সুখে সুখী করতে হলে, কি সংসার ক্ষেত্রে, কি ধর্ম ক্ষেত্রে, কি রাজনীতিতে সাম্য ও মৈত্রীর আশ্রয় নিতে হবে। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। আদর্শ জীবন, আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে কিভাবে মানুষ নির্বিবাদে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে, কি করে শ্রেণী, সম্প্রদায় ও জাতিগত স্বার্থপরতা ভেদ-বৈষম্য ও হিংসা-বিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়ে জগতের সকল মানুষ এক মহা মিলন তীর্থে মিলিত হতে পারে, এ সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের মানব প্রেমিক মনীষিগণ নানাভাবে চিন্তা ও চেষ্টা করে যে সত্য উপলব্ধি করেছেন, আধুনিক সভ্যতার সঙ্কটেরও যুগ সমস্যার কণ্ঠকিত গঠন পথে এসেও দেখা যায়, সেই সত্যই প্রচার করেছেন, তার একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে সাম্য ও মৈত্রী।

স্বদেশবাসীর জীবন বোধ, সর্বতীর্থসার জননী জন্মভূমির প্রতি গৌরব, দেশাত্মবোধ এবং আপন জীবনের মূল্যবোধ– এই ত্রিবিধ বোধের সমন্বয় ঘটিত সাম্যবোধ যে ক্ষেত্রে একই সূত্রে গ্রথিত হয়। সম-তিন বাহু বিশিষ্ট ত্রিভুজের ন্যায় যে ক্ষেত্রে আর এক চুলভর পরিমিত পার্থক্য থাকেনা। সেখানেই সাম্য শান্তি, বিশ্ব কল্যাণ বোধ। কবিগুরু স্বদেশকে সাগর-বিধৌত মহান পুণ্যতীর্থ রূপে আখ্যায়িত করেছেন। তীর্থ শব্দের সাধারণ অর্থ-পুকুরের ঘাট অর্থাৎ সেখানে শারীরিক মল ধৌত হয় বলে তীর্থ আর যেখানে মহামানবের আবির্ভাব তিরোভাব, ধর্ম প্রচার ও মহা প্রয়াণ লাভ যে সব স্থান দর্শন করে বিশ্বের মানব সমাজ জন্ম-জন্মান্তরের ক্লেশ মোচন বা পাপ ধৌত করে জীবন বিশুদ্ধি লাভ করে– সে স্থানগুলোও তীর্থ নামে বিখ্যাত। এই লক্ষ্যে কবিগুরু মহাসাগর তীরবর্তী বৃহত্তর ভারতকে মহামানবের পূত পবিত্রের মহান পূণ্যতীর্থ রূপে বর্ণনা করেছেন। সাম্য মৈত্রী করুণা যেমন ছিল বুদ্ধ জীবনে অপরিসীম, তেমনি ছিল কবিগুরুর বিশাল অন্তরে ভরপুর। তা-ই তিনি আজীবন বুদ্ধ-জীবন, বিশ্বের প্রাণী নিচয়ও আপন জীবন বোধের মধ্যে ভেদ বৈষম্য, অসাম্য দেখতে পাননি। বস্তুতঃ এরূপ বিশাল ক্ষেত্রে স্বদেশের প্রতি দেশপ্রেম, অচলান্ত গভীর ভক্তিবোধ থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক। তদ্ধেতু

স্বতঃসিদ্ধ দৃষ্টিতে তিনি 'ভারত তীর্থ' নামক কবিতায় সাম্যের জয়গান সুরে লেখলেনঃ-

হে মোর চিত্ত, পূণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
হেতায় দাঁড়িয়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।
ধ্যান গম্ভীর এই যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর
হেতায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।।

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা – তীর্থ নীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।।

সমতুল্য ঃ-

বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শ উদ্দেশ্য নীতি হল– সার্বজনীন, সার্বকালীন সার্বদেশিক। বিশ্বের সকল ভেদ-বৈষম্য নীতি বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী বিদ্রোহ। বিশেষতঃ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় হাড়ি-ডোম, মুচি-মেথর, ম্লেচ্ছ, পুক্কুস, চামার, চন্ডাল প্রভৃতি নীচ জাত সমূহ সমাজে অপাংক্তেয়, অস্পৃর্শ, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, অশুচি। তাদের সাথে উচ্চ বর্ণের আচার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। আহার বিহার, সামাজিক অকর্তব্য। যে মহামানব সকল প্রকার ভেদ-বুদ্ধি ভেদ-জ্ঞানের উর্দ্ধে, সমগ্র মানব জাতিকে এক অভিন্ন অখণ্ড জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছেন। শুধু মানবকে কেন, সমগ্র প্রাণী জগতের প্রাণের প্রতি সমদর্শী সমমর্মী। একাত্ম; যিনি কোনরূপ দাসত্বকে, মানবতার গ্লানিকে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি হচ্ছেন করুণাঘন তথাগত বুদ্ধ। তিনি বিশ্বকে বিশ্ব দেবতার প্রতিমূর্তি। বিশ্ব মানবের মিলন ক্ষেত্র। স্বর্গাদপি গরিয়সী তীর্থ ভূমি, আপন জন্মভূমিরূপে উপলব্ধি করেছেন– তিনিই বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বশান্তি, বিশ্বপ্রেম।

তাঁর অন্তরে কেহ অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ নহে। কেহ অবহেলিত অনাদৃত নহে। সমদ্র বিশ্বের সাথে তিনি অভিন্ন প্রাণ। তদ্ধেতু কবিগুরু বিশ্বগুরুকে উপলক্ষ করে প্রার্থনাচ্ছলে অন্যত্র বলেছেন–

তোমার লাগিয়া কারেও হে প্রভু,
পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমা পানে রবে টানিতে।
সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম
আমার হৃদয় খানিতে।

সবার সহিতে তোমার বাঁধন
হেরি যেন সদা এই মোর সাধন।
সবার সঙ্গে পারি যেন মনে
তব আরাধনা আনিতে।
সবার মিলনে তোমার মিলন
জাগাবে হৃদয় খানিতে।।

পৃথিবীতে অশুভ অন্যায় অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে আছে। উহার শক্তি বড় প্রবল। বহুবিধ শুভ প্রচেষ্টা থাকলেও এই ভয়ঙ্কর অন্যায় অত্যাচারকে জয় করতে পারে, এহেন শক্তি কারো নেই। ইহাকে জয় করতে পারে একমাত্র সৌম্য ও সাম্য। পরলোক, দুঃখ, মুক্তি দূরের কথা, ইহা না থাকলে এই জগতের সকল মঙ্গলই যে অচল হয়ে যায়। নানাবিধ বিঘ্ন সঙ্কুল পৃথিবীতে সুখোৎসব সৃষ্টি করতে হলে ইহাকে নানা দেশ, জাতি-উপজাতি, বিদেশী-বিজাতি এভাবে খন্ড-বিখন্ড ও বিচ্ছিন্ন রূপে না দেখে এক অখন্ড মানব জাতিরূপে দেখতে হবে। কোনরূপ দুঃখ অশান্তি 'তার নিজের দুঃখ' 'এ দেশের দুঃখ' বা 'এ জাতির দুঃখ'– এভাবে বিচ্ছিন্ন না করে এক অখন্ড দুঃখ রূপে দর্শন করে তার প্রতিকার করতে হবে। নানা অবয়ব যুক্ত হলেও আমাদের এই দেহ যেমন এক ও অভিন্ন, তেমনি দেশ, জাতি বা ব্যক্তি বিশেষ ইহার অবয়ব মাত্র। কর-চরণাদির সুখ-দুঃখ যেমন আমাদের নিকট এক, ভিন্ন নহে, সমস্ত জগতের সুখও তেমনি ভিন্ন নহে, এক।

"যেমন মোদের প্রাণ তেমন তাদের
যেমন তাদের প্রাণ তেমন মোদের।"

ইহা একান্ত সত্য যে, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যখন অবরুদ্ধ হয়ে যায়, তখন বাস্তব সত্যের সন্ধান স্পৃহা তার মন থেকে বিলুপ্ত হয়। অসত্যের প্রভাবে সম্যক দর্শন ও স্বাচ্ছন্দ্য গতিশীলতা হারিয়ে মানুষের জীবন অন্ধত্ব ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদ, আত্মম্ভরিতা, একদেশ দৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক ও নিকায়গত ভাবের দাপটে বিচার-বুদ্ধি মোহিত। সেখানে সাম্য-সৌম্যের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে। ধর্মও সেখানে নিষ্প্রাণ নির্জীব সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও নিছক বিচ্ছিন্নতাবাদের রূপ ধারণপূর্বক ধোকাবাজিতে পরিণত হয়।

অসীম সমুদ্রের সহিত নদী সমূহের যেরূপ মিলন, জগতের অনন্ত প্রাণীর প্রাণের সহিত নিজেদের প্রাণের সেরূপ বাধাহীন ভেদরহিত যে মহামিলন তা-ই তো অনন্ত জীবন। তা-ই তো সাম্য সৌম্যের প্রকৃত পরিচয়। সাম্য সৌম্য, মৈত্রী করুণার সাধনা জগতের সুখ-দুঃখের সাথে আপন সুখ-দুঃখ একত্রীভূত করে দেয়। সাধক অপরের সুখ-দুঃখে তন্ময় হয়ে আমিত্ব হতে মুক্তি লাভ করেন। অন্তরে তাঁর দ্বৈতভাব শূন্য হয়ে যায়, আত্ম-পর ভেদ-জ্ঞান ভেদ-বুদ্ধি লোপ পায়।

মহামৈত্রী, মহাকরুণা এবং সাম্য সৌম্যের পূর্ণতা সাধক মূর্ত প্রতীক করুণাঘন তথাগত বুদ্ধের পরমা শান্তিচ্ছটা জগজ্জীবনে বিচ্ছুরিত হোক।

সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা।

